গল্প

সখী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

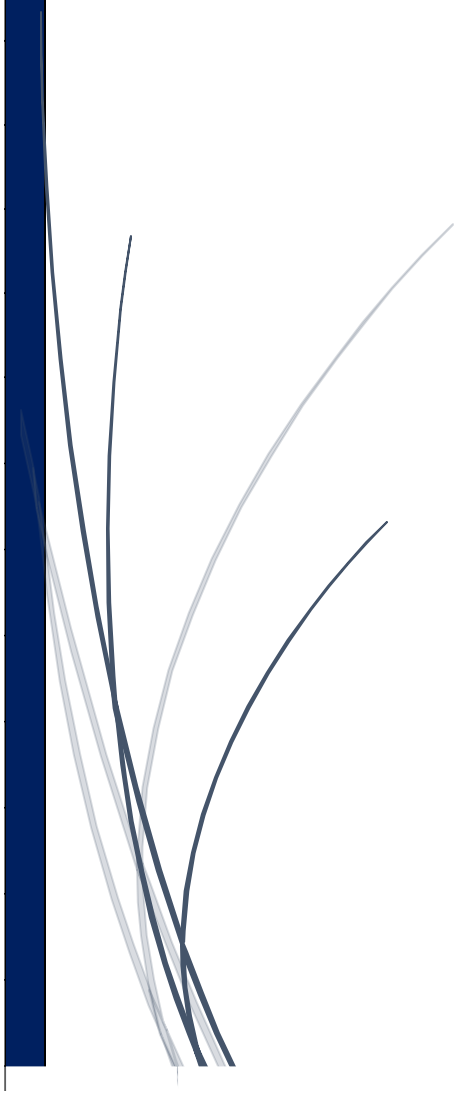

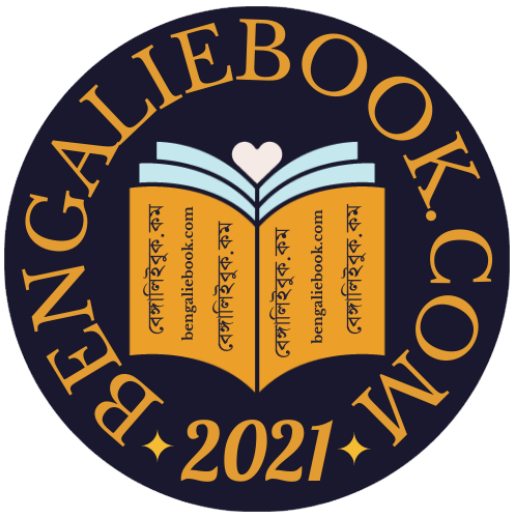

সখী

সদরের কড়া নড়তে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বিভা বলে, দ্যাখ তো রিনা কে, কাদের চায়।

উপরে নিচে পাঁচ ঘর ভাড়াটে। উপরে তিন, নিচে দুই। বাইরে লোক এলে দরজা খুলে খোঁজ নেবার দায়িত্ব স্বভাবতই নিচের তলার ভাড়াটে তাদের উপর পড়েছে, বিভা এবং কল্যাণীদের। সদর থেকে ভিজে স্যাঁতসেঁতে একরত্তি উঠানটুকু পর্যন্ত সরু

প্যাসেজের এপাশের ঘরটা তাদের, ওপাশেরটা কল্যাণীদের। ভিতরে আরো। একখানা করে ছোট ঘর তারা পেয়েছে–কিন্তু রান্নাঘর মোটে একটি। কল্যাণীরা রান্নাঘরের ভেতরে রাধে, বিভা রাধে বারান্দায়। তবে সুবিধা অসুবিধার হিসাব ধরলে লাভটা কাদের হয়েছে ঠিক করা অসম্ভব। রান্নাঘরখানা খুপচি, আলো-বাতাস খেলে না, উনান ধরলে একেবারে হাড়কাঁপানো দিনগুলো ছাড়া শীতকালেও ভাপসা গরমে বেশ কষ্ট হয়। নিশ্বাস আটকে আসে, মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে আকাশের ফালিটুকুর দিকে মুখ তুলে হাঁপ ছাড়তে হয়। বারান্দায় আবার জায়গা এই এতটুকু, নড়াচড়া করতেও অসুবিধা হয়।

সাধারণত কল্যাণীরাই সদরের কড়া নাড়ায় বেশি সাড়া দেয়–তাড়াতাড়ি বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গে দেয়। বিভাদের বা উপরতলার ভাড়াটেদের কাছে লোকজন কদাচিৎ আসে, কল্যাণীরা নিজেরাও সংখ্যায় অনেক বেশি, দেখা করতে বেড়াতে বা কাজে বাইরের লোকও ওদের কাছেই বেশি আসে। অন্য ভাড়াটেদের তুলনায় বাইরের জগতের সঙ্গে ওদের যোগাযোগ অনেক বেশি।

কল্যাণীরা সম্ভবত রান্নাঘরে খেতে বসেছে বা অন্য কাজে ব্যস্ত আছে, বিভার রান্না খাওয়ার পাট অনেক আগেই চুকে যায়। দু-এক মিনিট দেখে ওদের কাছেই লোক এসেছে

ধরে নিয়েও শোয়া রিনাকে তুলে সে খবর নিতে পাঠিয়ে দেয়। এটুকু করতে হয় এক বাড়িতে থাকলে।

ক্ষীণ অস্পষ্ট আশা কি জাগে বিভার মনে যে আজ হয়তো তার কাছেই কেউ এসেছে? কেউ তো একরকম আসেই না, যদিই-বা কেউ আজ এসে থাকে!

একটু পরেই ফ্রক-পরা তিন বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে বিভার সমবয়সী একটি মেয়ে খোলা দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়।

ভাবতে পেরেছিলি? কেমন চমকে দিয়েছি।

তাকে দেখেই বিভা ধড়মড় করে উঠে বসেছিল, ব্যাকুল ও উৎসুক কণ্ঠে সে বলে, রানী! ইস, কী রোগা হয়ে গেছিস! কী চেহারা হয়েছে তোর?

রানী যেন বেশ একটু ভড়কে যায়, মুখের হাসি খানিকটা মিলিয়ে আসে।

তা যদি বলিস, তুইও তো কম রোগা হসনি। কালো হয়ে গেছিস যে, তোর অমন রং ছিল?

দুই সখী ব্যাকুল ও প্রায় খানিকটা ভীতভাবে পরস্পরের সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে দেখতে থাকে। দুজনেরই ভাঙাচোরা অতীতের প্রতিবিম্ব নিয়ে যেন দুটি আয়নার মতো তারা পরস্পরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন খারাপ হয়ে গেছে চেহারা, এত ময়লা হয়েছে রং, অমন ক্লিষ্ট হয়েছে চোখ? এতখানি উপে গেছে স্বাস্থ্যের জ্যোতি, রূপ-লাবণ্য? প্রতিদিন আয়নার সামনে তারা চুল বাঁধে, মুখে পাউডার, সিঁথিতে সিঁদুর দেয়, নিজেকে রোগা মনে হয়, কখনো একটু আফসোস জাগে। কিন্তু আজ বন্ধুর চেহারা চেয়ে দেখার আগে পর্যন্ত তারা ধরতেও পারেনি কবছরে কী শোচনীয় পরিবর্তন ঘটে গেছে নিজের দেহেও, কীভাবে শুকিয়ে সিটকে গেছে।

আয় রানী বোস। কটি হল?

বিভা রানীর মেয়ের হাত ধরে কোলে টেনে নেয়।

কটি আবার? এই একটি। তোর?

.

কতকাল কেটেছে, কবছর? এই তো সেদিন তাদের বিয়ে হল, যুদ্ধ বাঁধার পর একে একে দুজনেরই। বছর পাঁচেক কেটেছে তাদের শেষ দেখা হবার পর। পাঁচ বছরে একটি মেয়ে হয়ে রানীর সেই আঁটো ছিপছিপে গড়ন, যা দেখে তার প্রতিদিন হিংসা হত, সে গড়ন ভেঙে এমন চাঁচাছোলা প্যাকাটির মতো বেঢপ হয়ে গেছে? কণ্ঠার হাড় উঁকি মারছে, চিবুকের ডৌল বুঝি আর খুঁজলেও মেলে না। অমন মিষ্টি কোমল ফরসা রং জলে-ধোয়া কাটা মাছের মতো কটকটে সাদা হয়ে গেছে। বিভা ভাবে আর উতলা হয়, তার চোখে জল আসে। বিভার দুটি ছেলেই ঘুমোচ্ছিল, ছোটটির দিকে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে রানী মৃদুস্বরে বলে, ওর কত বয়স হল?

দু- বছর।

দুটি ছেলেই রোগা, ছোটটির পেট বড়, হাতপা কাঠির মতো সরু। ওদিকে দেখতে দেখতে রানী নিজের চেহারার কথা ভুলে গিয়েছিল। আচমকা সে বলে, কী আর করা যাবে, বেঁচেবর্তে যে আছি তাই ঢের। যা দিনকাল পড়েছে।

সত্যি! শেষ করে দেবে।

বিভা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সে ভুলে গিয়েছিল কী ভয়ংকর দুর্দিনের মধ্যে কী প্রাণান্তকর কষ্টে তারা বেঁচে আছে, ভুলে গিয়েছিল কী অবস্থায় কী খেয়ে কত দুশ্চিন্তা আর আতঙ্ক বুকে নিয়ে তারা দিন কাটায়। ছেলেবেলা থেকে শুনে শুনে আর অস্পষ্ট অনুভব করে মনের মধ্যে যে রহস্যময় ভীতিকর একটা চোরাবালির স্তর গড়ে উঠেছে, যার অতল বিষাদ আর হতাশায় মিছে মায়ার মতো দুদিনের অর্থহীন। লীলাখেলার মতো জীবন

যৌবন তলিয়ে যায়, সেটা আজ আলোড়িত হয়ে উঠেছিল। এই তবে জীবনের রীতিনীতি মানুষের বাঁধাধরা অদৃষ্ট যে এত তাড়াতাড়ি তারুণ্য আনন্দ উৎসাহ সব শেষ হয়ে যায়? জীবনের এই চিরন্তন নিয়মেই সে আর বিভা জীবনটা শুরু করতে না করতে মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়সে এমন হয়ে গেছে? রানী তাকে মনে পড়িয়ে দিয়েছে, না, তা নয়! জীবন অত ফাঁকিবাজি নয়, এমন ভঙ্গুর নয় দেহ। শুধু খেতে পরতে না পেয়ে, চিন্তায় ভাবনায় জর্জরিত হয়ে, হাসিখুশি আমোদ-আহ্লাদের অভাবে তাদের এই দশা।

একা এসেছিস রানী?

একা কেন? ঘোড়ায় চেপেই এসেছি, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

কী আশ্চর্য! তুই কী বল তো? এতক্ষণ বলতে নেই?

অসহায়ভাবে বিভা পরনের কাপড়খানার দিকে তাকায়। রানী একখানা ভালো কাপড় পরে এসেছে, আগেকার দিনের সঞ্চিত তোরঙ্গে তোলা কাপড়ের একখানা, বিয়েবাড়ির মতো বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া কেউ যা পরে না, পরলে মানায়ও না। এ রহস্যের মানে বিভা জানে, তারও একই অবস্থা। আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি যেতে, সিনেমা। দেখতে, বেড়াতে বার হতে সাধারণ রকম ভালো কাপড় যা মানায় তার তোরঙ্গেও আগেকার পাঁচ-সাতখানা ছিল, বাড়িতে পরে পরে সে ভাণ্ডার শেষ হয়েছে। এ দুঃশাসনের শেষে দ্রৌপদীদের কাপড় টানাটানির শেষ নেই।

বিয়ের সময়ের দামি শাড়ি আর ঘরে পরার শাড়ির মাঝামাঝি কিছু নেই, রাখা অসম্ভব। ঘরেও তো উলঙ্গ হয়ে থাকতে পারে না মেয়েমানুষ? ইতিমধ্যে মরিয়া হয়ে চোখ কান বুজে সাধারণ সামাজিকতা রাখার জন্য সাধারণ রকম ভালো দু-একটা কাপড় সে কিনেছে, প্রাণপণে চেষ্টা করেছে এই প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার না করার কিন্তু সম্ভব হয়নি। চব্বিশ ঘণ্টা দেহ ঢাকতে হয়, বাসি কাপড় ছাড়তে হয়, স্নান করে ধুতে হয়, সাবান কেচে ধোপে দিয়ে ধোয়াতে হয়-নিত্যকার এই চলতি প্রয়োজনের দাবি সবচেয়ে কঠোর। তাই

ভাবতে হয়েছে, এখনকার মতো পরে কটা দিন চালিয়ে দিই, উপায় কী, ধোপ দিয়ে এনে তুলে রাখব। তুলে রেখেছে কিন্তু বেশি দিন তুলে রাখা যায়নি।

আলনার শাড়ি দু-খানার একটি পরনের খানার মতোই ছেঁড়া, অন্যটি বড় বেশি ময়লা। বাক্স কি খোলা যায়? রানীর স্বামী সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এখন কি অত সমারোহ করা চলে? হাত বাড়িয়ে সে ময়লা কাপড়খানাই টেনে নেয়।

কল্যাণী অমিয়কে জিজ্ঞাসা করছিল, কাকে চান? কল্যাণী বিভার চেয়ে দশ বছরের বড় হবে, তার বেশি নয়। তার দুটি ছেলেমেয়ে, সংসারে এগারজন লোক। সেই চাপে তার লজ্জাশরম মুষড়ে গেছে। আঁচিয়ে উঠে সদরে মানুষ দেখে এক কাপড়ে সে অনায়াসে তার প্রয়োজন জানতে এসেছে, তার সংকোচ নেই দ্বিধা নেই অস্বস্তি নেই। দাসীর মতো দেখায় না রানীর মতো দেখায়, বাইরের অজানা লোকের। চোখে কেমন লজ্জাকর ঠেকে এ চিন্তার অঙ্কুরও বুঝি আর গজায় না তার মনে, এমন শক্ত অনুর্বর হয়ে গেছে তার মধ্যবিত্তের অভিমান। ২০০

কিন্তু কী ভয়ানক কথা, নিজেও বিভা যে এগিয়ে এসেছে ব্লাউজ না গায়ে দিয়েই! এটা তারও খেয়াল হয়নি। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে যায় বলে দশটা নাগাদ বাড়ির পুরুষরা আপিসে কাজে বেরিয়ে গেলেই সে ব্লাউজ খুলে ফেলে, বিকালে পুরুষদের ফেরার আগে একেবারে গা ধুয়ে আবার গায়ে দেয়। খালি গায়ে থাকাটা কি তারও অভ্যাস হয়ে গেল কল্যাণীর মতোই। দাসী চাকরানি মজুরনির মতোই? কান দুটি গরম হয়ে ওঠে বিভার।

আমাদের এখানে এসেছেন, সে কল্যাণীকে বলে, সেই যে রানীর কথা বলেছি আপনাকে, আমার ছেলেবেলার বন্ধু? তার স্বামী।

আপনার অসুখ নাকি? কল্যাণী বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করে।

অসুখে পড়েছিলাম, এখন সেরে উঠেছি।

কল্যাণী বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস করে না, অমিয়র চেহারায় সেরে ওঠার লক্ষণ খুঁজে পাওয়া সত্যই কঠিন। কোনো রোগ সেরে গেলে এ রকম চেহারা হয় না মানুষের, রোগ বজায় থাকলেই হয়। কালিপড়া চোখে শুধু তার দৃষ্টিটা উজ্জ্বল ঝকঝকে।

ওহ, মনে পড়েছে, কল্যাণী আচমকা বলে, আপনারই গুলি লেগেছিল। কাগজে পড়ে বিভা বলেছিল আপনার কথা।

এত বড় কথাটা ভুলে যাবার জন্য কল্যাণী অপরাধীর মতো হাসে।

অসুখও হয়েছিল। অমিয় বলে।

দশ মিনিটের বেশি অমিয় বসে না। কাজে যাবার পথে সে রানীকে শুধু পৌঁছে দিতে এসেছে। বেচারির গুলিও লেগেছে, সরকারি দপ্তরের চাকরিটিও গেছে। বন্ধুরা একটি কাগজে মোটামুটি একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাগজটি আবার সরকারবিরোধী, কাগজটাই কবে বন্ধ হয়ে যায় ঠিক নেই।

কিন্তু অমিয়কে বিশেষ শঙ্কিত মনে হল না। বরং কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসেছে। কী জানেন সব উনিশ আর বিশ, সে বিভাকে বলে, ও ছাতার চাকরি থেকেই-বা কী এমন স্বর্গলাভ হচ্ছিল? ঘরে বাইরে চাকরির মর্যাদা রাখতে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। নিজের মনটাও মানে না, যেমন যোক চাকরি তো করি, মাস গেলে মাইনে তো পাই যা হোক, একদম মিনিমাম ভদ্রলোকের স্ট্যান্ডার্ড তো অন্তত রাখতে হবে? সে এক ছুঁচো গেলার অবস্থা, পেটও ভরতে পারি না, না-খেয়ে মরতেও পারি না। এখন শালা বেশ আছি, হয় এসপার নয় ওসপার; ব্যস!

অনায়াসে বিনা দ্বিধা সংকোচে সে বিভার সামনে শালা শব্দটা উচ্চারণ করে। সত্যই করে। কী ছোট লোক হয়ে গেছে শিক্ষিত মার্জিত ভদ্রসন্তান! পাশে কোথায় রেডিওতে মিষ্টি অলস সুরে গান বাজছে, উঠোনে এঁটো বাসনের ঝনঝনানি। কল্যাণীদের বাসনের সঙ্গে

দোতলার এঁটো বাসনও উঠোনে এসে জড়ো হচ্ছে। একসঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে কাঁদছে তিনটে অথবা চারটে, সংখ্যাটা ঠিক ধরা যায় না।

উঠে দাঁড়িয়ে অমিয় বলে, আপনার চিঠি পাবার পর থেকে বাড়ি বয়ে এসে ঝগড়া করার জন্য কোমর এঁটে বসেছিল, আমার অসুখের জন্য দেরি হয়ে গেল।

কিসের ঝগড়া?

বলে নি? চিঠিটা পড়ে কেবলি বলত, দেখলে? ছেলেবেলার বন্ধু, কত ভাব ছিল, কাগজে গুলি লাগার খবর পড়ে একটা চিঠি লিখে দায় সেরেছে। কর্তাটিকে পাঠিয়েও তো খবর নিতে পারত?

ওহ! এই ঝগড়া!-বিভা সত্যই ব্রিত বোধ করে,-যাব মনে করেছিলাম। ওঁকে তাগিদ দিয়েছি, এক মাসের ওপর যাব যাব করছেন-

কিন্তু যেতে পারেননি। কোটরে বসা চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টিতে সোজা বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে দশ মিনিটে গড়া আশ্চর্য অন্তরঙ্গতায় মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অমিয় সহজ সহানুভূতির সায় জানিয়ে বলে, আপিস, ছেলে পড়ানো, বাজার, রেশন, কয়লা, ওষুধ, ডাক্তার-কী করেই-বা পারবেন?

এখনো ছুঁচো গেলার অবস্থা।-বিভা প্রাণ খুলে হাসে।

অমিয় চলে গেলে বিভা সহজভাবে বলে, নে কাপড়টা ছেড়ে হাতপা এলিয়ে বোস, সং সেজে থাকতে হবে না।

সত্য কথা বলতে কী, রানীকে এতক্ষণ সে প্রাণ খুলে গ্রহণ করতে পারেনি, ভিতরে একটা আবিষ্ট ভাব বজায় থেকে গিয়েছিল। খুশি হলেও সে আনন্দে খাদ ছিল। হোক সে ছেলেবেলার সখী, মাঝখানে অনেক ওলটপালট হয়ে গেছে চারদিকে ও তার নিজের জীবনে। কে বলতে পারে তাকে কী রকম দেখবে কল্পনা করে এসেছে রানী, তার কাছে

কী রকম ব্যবহার আগে থেকে মনে মনে চেয়ে এসেছে? হয়তো অনেক কিছু অন্য রকম দেখে তার ভালো লাগছে না–হয়তো সে ভুল বুঝছে তার কথা ও ব্যবহার, আরো হয়তো ভুল বুঝবে! এই একখানা আর পাশের আধখানা নিয়ে দেড়খানা ঘরে কত দিকে যে বিষিয়ে গেছে জীবনটা, সে নিজেই কি খানিক খানিক জানে না? রানী এসে দাঁড়ানো মাত্র তার ফ্যাকাশে ম্লান চেহারা দেখে উতলা হওয়ার সঙ্গে প্রাণটা তার ধক করে উঠেছিল বিপদের আশঙ্কায়! তার সখী এসেছে, এককালে দিনে অন্তত একবার যাকে কাছে না পেলে সে অস্থির হয়ে পড়ত, এতদিন পরে সেই সখী এসেছে তার ঘরের দরজায়–আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওকে তো সে অভ্যর্থনা করতে পারবে না, হেসে কেঁদে অনর্গল আবোল-তাবোল কথা যা মনে আসে বলে গিয়ে প্রমাণ দিতে পারবে না সে কৃতার্থ হয়েছে! সে সাধ্য তার নেই, হাজার চেষ্টা করেও বেশিক্ষণ সে আনন্দোচ্ছ্বাস বজায় রাখতে পারবে না, ঝিমিয়ে মিইয়ে তাকে যেতেই হবে। কী ভাববে তখন রানী? কী বিশ্রী অবস্থা সৃষ্টি হবে?

আরো ভেবেছিল : বিকাল পর্যন্ত যদি থাকে, চায়ের সঙ্গে ওকে কী খেতে দেব? ওর মেয়ে যদি দুধ খায়, দুধ কোথায় পাব? শ্রান্তিতে যদি ওর হাই ওঠে, বিছানায় কী পেতে দিয়ে ওকে আমি শুতে দেব?

দশ মিনিটের মধ্যে অমিয় তাদের সখিত্বকে সহজ করে বাস্তবের দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে। বিভার আর কোনো ভয় নেই, ভাবনা নেই, সংকোচও নেই। কারণ, কোনো অভাব, কোনো অব্যবস্থার জন্য রানী তাকে দায়ী করবে না, তার মেয়ে দুধের খিদেয় কাঁদলে সে যদি শুকনো দুটি মুড়ি শুধু তাকে খেতে দেয়, তাতেও নয়! চাঁদরের বদলে ময়লা ন্যাকড়া পেতে দিলেও গা এলিয়ে রানী তাকে গাল দেবে না মনে মনে।

এটুকু অমিয় তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

ময়লা শাড়িখানা পরে রানীও যেন বাঁচে।

একটা পান দে না বিভা?

কোথা পাব পান? ত্যাগ করেছি। মাসে তিন-চার টাকা খরচ-কী হয় পান খেয়ে? একটি লবঙ্গ মুখে দিলে মুখশুদ্ধি হয়। নে। বিভার বাড়ানো হাতে প্ল্যাসটিকের চুড়ি নজর করে রানী হাসে। তুইও ধরেছিস? ভাগ্যে এ ফ্যাশনটা চালু হচ্ছে-সোনা না দেখে লোকে কিছু ভাবে না।

ফ্যাশন কি এমনি চালু হয়? যেমন অবস্থা, তেমন ফ্যাশন। সোনা নেই তোর?

টুকটাক আছে। তোর?

চারগাছা চুড়ি, সরু হারটা আর কানপাশা। ও বছর টাইফয়েডের এক পালা গেল, তারপর আমার কপাল টানল হাসপাতালে। মরবে জেনেও কেন যে পেটে আসে বুঝি না ভাই। আমাকেও প্রায় মেরেছিল, কী যে কষ্ট পেলাম এবার। অথচ দ্যাখ, এ দুটোর বেলা ভালো করে টেরও পাইনি। দিনকাল খারাপ পড়লে কি মানুষের বিয়োনের কষ্টও বাড়ে?

বাড়ে না? খেতে পাবে না, মনে শান্তি থাকবে না, গায়ে পুষ্টি হবে না; বিয়োলেই হল?

দুই সখী অদ্ভুত এক জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে চোখে চোখে তাকায়, দুজনের মনে একসঙ্গে একই অভিজ্ঞতা একই সমস্যা জেগেছে, আজ দুজনের নিরিবিলি দুপুরে কাছাকাছি আসার সুযোগে পরস্পরের কাছে প্রশ্নটা তাদের যাচাই করে নিতেই হবে। জানতে হবে, খাপছাড়া অদ্ভুত একটা ফাঁদে পড়ার যে রহস্যময় ব্যাপারটা নিয়ে যন্ত্রণার অন্ত নেই, সেটা শুধু একজনের বেলাই ঘটেছে না দুজনেরই সমান অবস্থা। বুঝতে হবে কেন এমন হয়, এমন অঘটনের মানে কী?

রানী বলে, বল না? তুই আগে বল।

আগেও ঠিক এমনিভাবেই জীবনের গহন গভীর গোপন রহস্যের কথা উঠত, কেউ একজন মুখ খোলার আগে চোখমুখের ভাবভঙ্গি দেখেই দুজনে টের পেত যে জগতের সমস্ত মানুষের কাছ থেকে আড়াল করা শুধু তাদের দুই সখীর প্রাণের কথা বলাবলি হবে।

বিভা বলে, কিছু বুঝতে পারি না ভাই। এ রকম যাচ্ছেতাই শরীর, কী যে খারাপ লাগে বলার নয়, তবু আমার যেন বেশি করে ভূত চেপেছে। বিয়ের পর দু-এক বছর সবারই পাগলামি আসে; ও বাবা, এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তখন রীতিমতো সংযমী ছিলাম বলা চলে। আগে ভাবতাম ও বেচারির দোষ, ঝগড়া করে ও-ঘরের ঘুপটির মধ্যে বিছানা করে শোয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম। তখন টের পেলাম কী বিপদ, আমারও দেখি মরণ নেই! ঘুম আসবে ছাই, উঠে এসে যদি ডাকে ভেবে কী ছটফটানি আমার। বিশ্বাস করবি? থাকতে না পেরে শেষে নিজেই এলাম।

রানী একটু হাসে, উঠে এসে বললি তো একা শুতে ভয় করছে?

তোরও তবে ওই রকম?-বিভা যেন স্বস্তি পায়।

কী তবে? তোর একরকম আমার অন্যরকম?

দুই সখী আশ্চর্য হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

রানী বলে, তবে আমার আজকাল কেটে গেছে, অন্যদিকে মন দিতে হয়। তোরও কেটে যাবে।

একটু ভেবে রানী আবার বলে, আমার মনে হয় এ একটা ব্যারাম। ভালো খেতে না পেলে ভাবনায় চিন্তায় কাহিল হলে এ রকম হয়। ছেলেপিলেকে দেখিস না পেটের ব্যারাম হলে বেশি খাই খাই করে, চুরি করে যা-তা খায়?

চুরি করেও খাস নাকি তুই?

দুই সখী হেসে ওঠে।

সেই এক মুহূর্তের হাসির ক্ষীণ শব্দ সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে যায় শিশুর কান্না বাসন-নাড়ার-শব্দ মেশানো দুপুরের স্তব্ধতায়। শুধু শিশুর কান্না নয়, এ বাড়ির দোতলাতেই

মেয়েলি গলায় একজন সুর করে কাঁদছে। উপরতলায় একজন ভাড়াটে রমেশ, তার বুড়ি মা। রমেশের ছোট ভাই অশেষ, সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকরির ধান্ধায় ঘুরতে শুরু করেছিল, কদিন আগে টিবি রোগে সে মারা গেছে।

এই সেদিন দেখেছি চলাফেরা করছে, বিভা হঠাৎ শিউরে উঠে বলে, দিনরাত ঘুরে বেড়াত। ওর সঙ্গে তর্ক করত আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি কি না। এই বিছানায় বসে একদিন রাত্রে কথা কইতে কইতে কাশতে শুরু করল, এক ঝলক রক্ত উঠে চাঁদরে পড়ল। কী রকম ভ্যাবাচেকা খেয়ে যে চেয়ে রইল ছেলেটা। আগে একটু আধটু রক্ত পড়েছে গ্রাহ্যও করেনি, সেদিন প্রথম বেশি পড়ল। নিজের শরীরটাকে পর্যন্ত গ্রাহ্য করে না, কী যে হয়েছে আজকালকার ছেলেরা–

আনমনে কী যেন ভাবে, একটু ম্লান হেসে বলে, প্রথমে ঠিক হয়েছিল চাদরটা পুড়িয়ে ফেলব। কিন্তু তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা চাদর কিনতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাই–

এ কথাটাও বিভা শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে পারে না, আবার আনমনা হয়ে যায়।

কী ভাবি জানিস রানী? শুধু শাক-পাতা আর পচা চালের দুমুঠো ভাত খায়, না একফোঁটা দুধ না একফোঁটা মাছ। এই খেয়ে আপিস করা, রাত ৯টা পর্যন্ত ছেলে পড়ানো। একদিন যদি ওইরকম কথা কইতে কইতে কাশতে শুরু করে আর

এ কথারও শেষটা মুখে উচ্চারণ করা অসম্ভব।

রানী অসম্ভবকে সম্ভব করে যোগ দেয়,রক্তে বিছানা যদি লাল হয়ে যায়? আমিও আগে এ রকম আবোল-তাবোল কত কী ভাবতাম। রক্তে একদিন রাস্তাই লাল হয়ে গেল। আর ভাবি না। কী আছে অত ভয় পাবার, ভাবনা করার? সংসারে কুলি-মজুরও তো বেঁচে আছে, বেঁচে থাকবে।